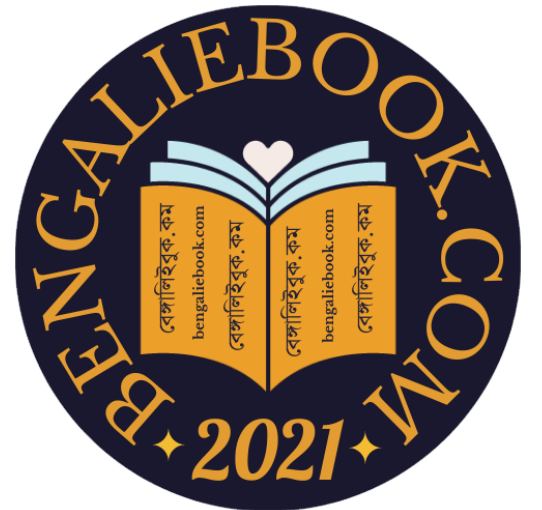


গল্প

কোঁচাঙ্গ, কোঁচা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়



কে বাঁচায়, কে বাঁচে!

সেদিন আপিস যাবার পথে মৃত্যুঞ্জয় প্রথম মৃত্যু দেখল-অনাহারে মৃত্যু! এতদিন শুধু শুনে আর পড়ে এসেছিল ফুটপাথে মৃত্যুর কথা, আজ চোখে পড়ল প্রথম। ফুটপাথে হাঁটা তার বেশি প্রয়োজন হয় না। নইলে দর্শনটা অনেক আগেই ঘটে যেত সন্দেহ নেই। বাড়ি থেকে বেরিয়ে দু-পা হেঁটেই সে ট্রামে ওঠে, নামে গিয়ে প্রায়। আপিসেরই দরজায়। বাড়িটাও তার শহরের এমন এক নিরিবিলি অঞ্চলে যে সে পাড়ায় ফুটপাথও বেশি নেই, লোকে মরতেও যায় না বেশি। চাকর ও ছোট ভাই তার বাজার ও কেনাকাটা করে।

কয়েক মিনিটে মৃত্যুঞ্জয়ের সুস্থ শরীরটা অসুস্থ হয়ে গেল। মনে আঘাত পেলে মৃত্যুঞ্জয়ের শরীরে তার প্রতিক্রিয়া হয়, মানসিক বেদনাবোধের সঙ্গে চলতে থাকে শারীরিক কষ্টবোধ। আপিসে পৌঁছে নিজের ছোট কুঠরিতে ঢুকে সে যখন ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল, তখন সে রীতিমতো কারু হয়ে পড়েছে। একটু বসেই তাই উঠে গেল কলঘরে। দরজা বন্ধ করে বাড়ি থেকে পেট ভরে যতকিছু খেয়ে এসেছিল ভাজা, ডাল, তরকারি, মাছ, দই আর ভাত, প্রায় সব বমি করে উগড়ে দিল।

পাশের কুঠরি থেকে নিখিল যখন খবর নিতে এল, কলঘর থেকে ফিরে মৃত্যুঞ্জয়। কাঁচের গ্লাসে জল পান করছে। গ্লাসটা খালি করে নামিয়ে রেখে সে শূন্যদৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল।

আপিসে সে আর নিখিল প্রায় সমপদস্থ। মাইনে দুজনের সমান, একটা বাড়তি দায়িত্বের জন্য মৃত্যুঞ্জয় পঞ্চাশ টাকা বেশি পায়। নিখিল রোগা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং একটু আলসে প্রকৃতির লোক। মৃত্যুঞ্জয়ের দু-বছর আগে বিয়ে করে আট বছরে সে মোটে দুটি সন্তানের পিতা হয়েছে। সংসারে তার নাকি মন নেই। অবসর জীবনটা সে বই পড়ে আর একটা চিন্তাজগৎ গড়ে তুলে কাটিয়ে দিতে চায়।

অন্য সকলের মতো মৃত্যুঞ্জয়কে সেও খুব পছন্দ করে। হয়তো মৃদু একটু অবজ্ঞার সঙ্গে ভালোও বাসে। মৃত্যুঞ্জয় শুধু নিরীহ শান্ত দরদী ভালোমানুষ বলে নয়, সৎ ও সরল বলেও নয়, মানবসভ্যতার সবচেয়ে প্রাচীন ও সবচেয়ে পচা ঐতিহ্য-আদর্শবাদের কল্পনা-তাপস বলে। মৃত্যুঞ্জয় দুর্বলচিত্ত ভাবপ্রবণ আদর্শবাদী হলে কোনো কথা ছিল না, দুটো খোঁচা দিয়ে খেপিয়ে তুললেই তার মনে পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার বেরিয়ে এসে তাকে অবজ্ঞেয় করে দিত। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া শ্লথ, নিস্তেজ নয়। শক্তির একটা উৎস আছে তার মধ্যে, অব্যয়কে শব্দরূপ দেবার চেষ্টায় যে শক্তি বহু ক্ষয় হয়ে গেছে মানুষের জগতে তারই একটা অংশ। নিখিল পর্যন্ত তাই মাঝে মাঝে কারু হয়ে যায় মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে। মৃদু ঈর্ষার সঙ্গে সে তখন ভাবে যে নিখিল না হয়ে মৃত্যুঞ্জয় হলে মন্দ ছিল না।

মৃত্যুঞ্জয়ের রকম দেখেই নিখিল অনুমান করতে পারল, বড় একটা সমস্যার সঙ্গে তার সংঘর্ষ হয়েছে এবং শার্শিতে-আটকানো মৌমাছির মতো সে মাথা খুঁড়ছে সেই স্বচ্ছ সমস্যার অকারণ অর্থহীন অনুচিত কাঠিন্যে।

কী হল হে তোমার? নিখিল সন্তর্পণে প্রশ্ন করলে।

মরে গেল! না খেয়ে মরে গেল! আনমনে অর্ধভাষণে যেন আর্তনাদ করে উঠল মৃত্যুঞ্জয়।

আরো কয়েকটি প্রশ্ন করে নিখিলের মনে হল, মৃত্যুঞ্জয়ের ভিতরটা সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। ফুটপাথে অনাহারে মৃত্যুর মতো সাধারণ সহজবোধ্য ব্যাপারটা সে ধারণা করতে পারছে না। সেটা আশ্চর্য নয়। সে একসঙ্গে পাহাড়প্রমাণ মালমশলা ঢোকাবার চেষ্টা করছে তার ক্ষুদ্র ধারণাশক্তির থলিটিতে। ফুটপাথের ওই বীভৎসতা ক্ষুধা অথবা মৃত্যুর রূপ? না-খেয়ে মরা, কী ও কেমন? কত কষ্ট হয় না-খেয়ে মরতে, কী রকম কষ্ট? ক্ষুধার যাতনা বেশি, না মৃত্যুযন্ত্রণা বেশি-ভয়ঙ্কর?

অথচ নিখিল প্রশ্ন করলে সে জবাবে বলল অন্য কথা-ভাবছি, আমি বেঁচে থাকতে যে-লোকটা না-খেয়ে মরে গেল, এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কী? জেনেশুনেও এতকাল চার বেলা

করে খেয়েছি পেট ভরে। যথেষ্ট রিলিফওয়ার্ক হচ্ছে লোকের অভাবে, আর এদিকে ভেবে পাই না কী করে সময় কাটাব। দিক, শত দিক আমাকে।

মৃত্যুঞ্জয়ের চোখ ছলছল করছে দেখে নিখিল চুপ করে থাকে। দরদের চেয়ে ছোঁয়াচে কিছুই নেই এ জগতে। নিখিলের মনটাও খারাপ হয়ে যায়। দেশের সমস্ত দরদ পুঞ্জীভূত করে ঢাললেও এ আগুন নিভবে না ক্ষুধার, অল্পের বদলে বরং সমিধে পরিণত হয়ে যাবে। ভিক্ষা দেওয়ার মতো অস্বাভাবিক পাপ যদি আজও পুণ্য হয়ে থাকে, জীবনধারণের অল্পে মানুষের দাবি জন্মাবে কিসে? রুঢ় বাস্তব নিয়মকে উল্টে মধুর আধ্যাত্মিক নীতি করা যায়, কিন্তু সেটা হয় অনিয়ম। চিতার আগুনে যত কোটি মড়াই এ পর্যন্ত পোড়ানো হয়ে থাক, পৃথিবীর সমস্ত জ্যান্ত মানুষগুলোকে চিতায় তুলে দিলে আগুন তাদেরও পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।

বিস্কুর চিত্তে এইসব কথা ভাবতে ভাবতে নিখিল সংবাদপত্রটি তুলে নিল। চোখ বুলিয়ে যেতে যেতে নজরে পড়ল, ভালোভাবে সাতির ব্যবস্থা করে গোটা কুড়ি মৃতদেহকে স্বর্গে পাঠানো হয়নি বলে একস্থানে তীক্ষ্ণধার হা-হুঁতাশভরা মন্তব্য। করা হয়েছে।

কদিন পরেই মাইনের তারিখ এল। নিখিলকে প্রতিমাসে তিন জায়গায় কিছু কিছু টাকা পাঠাতে হয়। মানিঅর্ডারের ফর্ম আনিয়ে কলম ধরে সে ভেবে ঠিক করবার চেষ্টা করছে তিনটি সাহায্য এবার পাঁচ টাকা করে কমিয়ে দেবে কি না। মৃত্যুঞ্জয় ঘরে এসে বসল। সেদিনের পর থেকে মৃত্যুঞ্জয়ের মুখ বিষণ্ণ গম্ভীর হয়ে আছে। নিখিলের সঙ্গেও বেশি কথা বলেনি।

একটা কাজ করে দিতে হবে ভাই। মৃত্যুঞ্জয় একতাড়া নোট নিখিলের সামনে রাখল।— টাকাটা কোনো রিলিফ ফান্ডে দিয়ে আসতে হবে।

আমি কেন?

আমি পারব না।

নিখিল ধীরে ধীরে টাকাটা গুনল।

সমস্ত মাইনেটা?

হ্যাঁ।

বাড়িতে তোর ন-জন লোক। মাইনের টাকায় মাস চলে না। প্রতিমাসে ধার করছিস।

তা হোক। আমায় কিছু একটা করতেই হবে ভাই। রাতে ঘুম হয় না, খেতে বসলে খেতে পারি না। এক বেলা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। আমার আর টুনুর মার একবেলার ভাত বিলিয়ে দি।

নিখিল এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। জ্বর হলে যেমন দেখায়, মৃত্যুঞ্জয়ের গোলগাল মুখখানা তেমনি থমথম করছে। ভেতরে সে পুড়ছে সন্দেহ নেই।

টুনুর মার যা স্বাস্থ্য, একবেলা খেয়ে দিন পনের-কুড়ি টিকতে পারবে।

মন্তব্য শুনে মৃত্যুঞ্জয় ঝাঁপিয়ে উঠল। আমি কী করব? কত বলেছি, কত বুঝিয়েছি, কথা শুনবে না। আমি না খেলে উনিও খাবেন না। এ অন্যায় নয়? অত্যাচার নয়? মরে তো মরবে না-খেয়ে।

নিখিল ভেবেছিল বন্ধুকে বুঝিয়ে বলবে, এভাবে দেশের লোককে ঝাঁচানো যায় না। যে অন্ন পাওয়া যাচ্ছে সে অন্ন তো পেটে যাবেই কারো- না-কারো। যে রিলিফ চলছে তা শুধু একজনের বদলে আর একজনকে খাওয়ানো। এতে শুধু আড়ালে যারা মরছে তাদের মরতে দিয়ে চোখের সামনে যারা মরছে তাদের কয়েকজনকে ঝাঁচানোর চেষ্টা করার সান্ত্বনা। কিন্তু এসব কোনো কথাই সে বলতে পারল না, গলায় আটকে গেল।

সে শুধু বলল, ভুরিভোজনটা অন্যায়, কিন্তু না-খেয়ে মরাটা উচিত নয় ভাই। আমি কেটেছেটে যতদূর সম্ভব খাওয়া কমিয়ে দিয়েছি। বেঁচে থাকতে যতটুকু দরকার খাই এবং

দেশের সমস্ত লোক মরে গেলেও যদি সেইটুকু সংগ্রহ করার ক্ষমতা আমার থাকে, কাউকে না দিয়ে নিজেই আমি তা খাব। নীতিধর্মের দিক থেকে বলছি না, সমাজধর্মের দিক থেকে বিচার করলে দশজনকে খুন করার চেয়ে নিজেকে না-খাইয়ে মারা বড় পাপ।

ওটা পাশবিক স্বার্থপরতা।

কিন্তু যারা না-খেয়ে মরছে তাদের যদি এই স্বার্থপরতা থাকত? এক কাপ অখাদ্য গ্রায়েল দেওয়ার বদলে তাদের যদি স্বার্থপর করে তোলা হত? অন্ন থাকতে বাংলায় না-খেয়ে কেউ মরত না। তা সে অন্ন হাজার মাইল দূরেই থাক আর একত্রিশটা তালা লাগানো গুদামেই থাক।

তুই পাগল নিখিল। বন্ধ পাগল। বলে মৃত্যুঞ্জয় উঠে গেল।

তারপর, দিন দিন কেমন যেন হয়ে যেতে লাগল মৃত্যুঞ্জয়। দেরি করে আপিসে আসে, কাজে ভুল করে, চুপ করে বসে ভাবে, এক সময় বেরিয়ে যায়। বাড়িতে তাকে পাওয়া যায় না। শহরের আদি অন্তহীন ফুটপাথ ধরে সে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। ডাস্টবিনের ধারে, গাছের নিচে খোলা ফুটপাথে যারা পড়ে থাকে, অনেক রাত্রে। দোকান বন্ধ হলে যারা হামাগুড়ি দিয়ে সামনের রোয়াকে উঠে একটু ভালো আশ্রয় খোঁজে, ভোর চারটে থেকে যারা লাইন দিয়ে বসে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মৃত্যুঞ্জয় তাদের লক্ষ্য করে। পাড়ায় পাড়ায় লঙ্গরখানা খুঁজে বার করে অন্নপ্রার্থীর ভিড় দেখে। প্রথম প্রথম সে এইসব নরনারীর যতজনের সঙ্গে সম্ভব আলাপ করত, এখন সেটা বন্ধ করে দিয়েছে। সকলে এক কথাই বলে। ভাষা ও বলার ভঙ্গি পর্যন্ত তাদের এক ধাঁচের। নেশায় আচ্ছন্ন অর্ধচেতন মানুষের প্যানপ্যানানির মতো ঝিমামানো সুরে সেই এক ভাগ্যের কথা, দুঃখের কাহিনী। কারো বুকে নালিশ নেই, কারো মনে প্রতিবাদ নেই। কোথা থেকে কীভাবে কেমন করে সব ওলটপালট হয়ে গেল তারা জানেনি, বোঝেনি, কিন্তু মেনে নিয়েছে।

মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ির অবস্থা শোচনীয়। টুনুর মা বিছানা নিয়েছে, বিছানায় পড়ে থেকেই সে বাড়ির ছেলেবুড়ো সকলকে তাগিদ দিয়ে দিয়ে স্বামীর খোঁজে বার বার বাইরে পাঠিয়ে

দেয়। কিন্তু এই বিরাট শহরের কোথায় আগন্তুক মানুষের কোন। জঞ্জালের মধ্যে তাকে তারা খুঁজে বার করবে! কিছুক্ষণ বাইরে কাটিয়ে তারা ফিরে আসে, টুনুর মাকে মিথ্যা করে বলে যে মৃত্যুঞ্জয় আসছে-খানিক পরেই আসছে। খবর দিয়ে বাড়ির সকলে কেউ গম্ভীর, কেউ কাদাঁদ মুখ করে বসে থাকে, ছেলেমেয়েগুলো অনাদরে অবহেলায় ক্ষুধার জ্বালায় চেষ্টা করে কাঁদে।

নিখিলকে বারবার আসতে হয়। টুনুর মা তাকে সকাতির অনুরোধ জানায়, সে যেন একটু নজর রাখে মৃত্যুঞ্জয়ের দিকে, একটু যেন সে সঙ্গে থাকে তার।

নিখিল বলে, আপনি যদি সুস্থ হয়ে উঠে ঘরের দিকে তাকান তাহলে যতক্ষণ পারি সঙ্গে থাকব, নইলে নয়।

টুনুর মা বলে, উঠতে পারলে আমিই তো ওর সঙ্গে ঘুরতাম ঠাকুরপো।

ঘুরতেন?

নিশ্চয়। ওঁর সঙ্গে থেকে থেকে আমিও অনেকটা ওঁর মতো হয়ে গেছি। উনি পাগল হয়ে যাচ্ছেন, আমারও মনে হচ্ছে যেন পাগল হয়ে যাব। ছেলেমেয়েগুলোর জন্য সত্যি আমার ভাবনা হয় না। কেবলি মনে পড়ে ফুটপাথের ওই লোকগুলোর কথা। আমাকে দু-তিন দিন সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে টুনুর মা আবার বলে, আচ্ছা, কিছুই কি করা যায় না? এই ভাবনাতেই ওঁর মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কেমন একটা ধারণা জন্মেছে, যথাসর্বস্ব দান করলেও কিছুই ভালো করতে পারবেন না। দারুণ একটা হতাশা জেগেছে ওঁর মনে। একেবারে মুষড়ে যাচ্ছেন দিন-কে-দিন।

নিখিল শোনে আর তার মুখ কালি হয়ে যায়।

মৃত্যুঞ্জয় আপিসে যায় না। নিখিল চেষ্টা করে তার ছুটির ব্যবস্থা করিয়ে দিয়েছে। আপিসের ছুটির পর সে মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে যায়-মৃত্যুঞ্জয়ের ঘোরাফেরার স্থানগুলো এখন অনেকটা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেও মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে কাটিয়ে দেয়, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে তাকে উল্টো কথা শোনায়, নিজের আগেকার যুক্তিতর্কগুলো নিজেই খণ্ড খণ্ড করে দেয়। মৃত্যুঞ্জয় শোনে কিন্তু তার চোখ দেখেই টের পাওয়া যায় যে কথার মানে সে আর বুঝতে পারছে না, তার অভিজ্ঞতার কাছে কথার মারপ্যাঁচ অর্থহীন হয়ে গেছে। ক্রমে ক্রমে নিখিলকে হাল ছেড়ে দিতে হয়।

তারপর মৃত্যুঞ্জয়ের গা থেকে ধূলিমলিন সিল্কের জামা অদৃশ্য হয়ে যায়। পরনের ধুতির বদলে আসে ছেঁড়া ন্যাকড়া, গায়ে তার মাটি জমা হয়ে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। দাড়িতে মুখ ঢেকে যায়। ছোট একটি মগ হাতে আরো দশজনের সঙ্গে সে পড়ে থাকে ফুটপাথে আর কাড়াকাড়ি মারামারি করে লঙ্গরখানার খিঁচুড়ি খায়। বলে, গা থেকে এইছি। খেতে পাই নে বাবা। আমায় খেতে দাও।